# আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

**- কাজী নজরুল ইসলাম---দোলনচাঁপা**

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে-
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে -
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার - ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে -
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগ বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!
আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ আসল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট, আসল সুদূর
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুবঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ জাগল সাগর, হাসল মরু
কাঁপল ভূধর, কানন তরু
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে।
মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!

## বিশ্লেষণ:

কবি নজরুলকে 'রোমান্টিক' অভিধায় পড়ার একটা রেওয়াজ আছে। রেওয়াজটা খুব একটা কাজের বলে মনে হয় না। বর্তমানলিপ্ততা আর বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার যে যৌথতা নজরুলের কবিস্বভাবের মূল, রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতা আর বিষাদ-মেদুরতা তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু গোটা কয়েক কবিতা নজরুল এমন লিখেছেন, এবং সেগুলো নজরুলের শ্রেষ্ঠ রচনার কাতারেই পড়বে, যেগুলো আবেগের প্রবলতায়, বেহিসাবি শব্দ-সঞ্চয়ের অভাবিত নৈপুণ্যে আর সংগীতগুণের প্রত্যক্ষতায় কবিতার শরীরকে ছাড়িয়ে চলে যেতে যায় বহুদূর। তুড়ীয় আবেগ আর সীমাহীন উল্লাসকে কবিতার প্রত্যক্ষ শরীরে বশ মানিয়ে অপ্রত্যক্ষ অসীমে রূপান্তর করতে চায়–ঠিক আবেগ আর উল্লাসের মতো করেই। এই বিশিষ্টতার কারণে নজরুলকে রোমান্টিক বলা যেতে পারে, যদি কেউ বলতেই চায়, কেবল এই শর্তে যে রোমান্টিকতা নজরুলের আর-আর কবি-স্বভাবকে ছাড়িয়ে কখনোই প্রধান হয়ে ওঠেনি। দোলন-চাঁপা গ্রন্থভুক্ত 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' এই সারির কবিতা–'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস' ইত্যাদির মতো–সংগীত ও গতির প্রচণ্ড প্রবাহে প্রাণাবেগকে মূর্ত করা এমন অভিজ্ঞতা, বাংলা কবিতায় আগে-পরে যার খুব একটা জুড়ি মেলে না।

কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন সম্ভবত জেলে বসে। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে তাঁকে বসন্ত নাটক উৎসর্গ করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে নজরুল এ কবিতা মারফত নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন বলে একটা কথা বাজারে চালু আছে। হতেও পারে। উপলক্ষ হিসেবে ঘটনাটা বেশ জুতসই। বিশেষত যে কবিতায় সৃষ্টির সুখ আর উল্লাসের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, সে কবিতার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যায়, ১৩৩০ সালের বৈশাখে। আর গোলাম মুরশিদ অনুমান করেছেন, এ কবিতা আরও আগেও লেখা হয়ে থাকতে পারে, আগের বছর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে। তখন কবি কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে অবস্থান করছিলেন। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি সেখানেই লেখা। গোলাম মুরশিদ খেয়াল করেছেন, 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় যে 'সৃজনশীলতার প্রবল আলোড়ন লক্ষ করা যায়', 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতার সঙ্গে তার গভীর মিল আছে। তিনি ঠিকই বলেছেন। 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতায় আছে সৃষ্টিশীলতার অমিতাচারী উদ্‌যাপন; আছে অমিতাচারকে প্রমিত শরীরে বেঁধে ফেলার বিস্ময়কর মুনশিয়ানা। তার মানেই হলো, কবিতাটি বন্ধনে মুক্তি ঘোষণার দারুণ নজির। আরও আছে–যে কথা খুব একটা বলা হয়নি–আছে নজরুলের কবি-স্বভাবের পরিচ্ছন্ন বয়ান। 'বিদ্রোহী', 'আমার কৈফিয়ত' কিংবা 'দারিদ্র্য' কবিতার মতো 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে'ও নজরুলের অন্যতম প্রধান কাব্য-ইশতেহার।

এ কবিতার বেগ এবং আবেগ মুক্তি পেয়েছে চার মাত্রার স্বরবৃত্তে। বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য-বিচারে এমনটিই হওয়ার কথা ছিল, যদিও ছন্দের নাম আর মাত্রার সংখ্যা কবিতাটির তাল-লয় সম্পর্কে প্রায় কিছুই প্রকাশ করে না। আমাদের স্মরণ করতে হয়, কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৯২২-২৩ সালে। তখনো নজরুলের সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতা ফিকে হয়ে যায়নি। সৈনিকজীবনের যূথবদ্ধ মার্চের মধ্যে যে বিশেষ রকমের ছন্দ ও দোলা আছে, যে বস্তু বাংলা কবিতায় আমদানি করে নজরুল একদা নিজের ছন্দ-ব্যক্তিত্ব জানান দিয়েছিলেন প্রবলভাবে, তার স্মরণীয় মূর্তি পাচ্ছি

‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতার ছন্দ-লয়ে। তার এক উপাদান পঙ্‌ক্তি ও স্তবকের বিশেষ সজ্জা। এটি অবশ্য বাংলা কবিতার জন্য নতুন ছিল না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উত্তুঙ্গ সাফল্য নিশ্চয়ই নজরুলের জন্য সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু আরও দুটি কাব্যিক উপকরণ যোগ হয়েছে এ কবিতায়। একটি অতিপর্ব, আর অন্যটি হলন্ত ধ্বনির তুর্কি-নাচন। অতিপর্ব নজরুলের আবিষ্কার নয়। কিন্তু এই কাব্যিক কলাটি নজরুলের হাতেই চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছিল। তিরিশি কবিতার সংস্কার-কুসংস্কারে বাংলা কবিতায় সুরের সম্মোহন কমে আসার আগেই নজরুল অতিপর্বকে তাঁর সফলতম কবিতাগুলোর অনিবার্য কলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। কবিতাটির শুরুর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়া যাক:

আজ  সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে–
মোর  মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ  সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

শুরুর ‘আজ’ শব্দটি ডানের পূর্ণ পর্বের সঙ্গে মাঝের শূন্যস্থানসূত্রে দৃশ্যত ব্যবধান তৈরি করেছে। ধ্বনিগত ও ভাবগত দিক থেকে এ ব্যবধান আরও গভীর। ফলে শব্দটি আলাদা উচ্চারণ করতে হয়, বিরতি নিতে হয়, তারপর যেতে হয় পরের পর্বে। দৌড় শুরুর আগে দৌড়বিদ যেমন এক পায়ে ভর দিয়ে গতি সঞ্চয় করেন। তারপর শুরু হয় রিলে রেস। কাঠি-বদলের বিরাম ছাড়া সেই রেস চলতেই থাকে, যতক্ষণ না আমরা পৌঁছে যাই অনতিদীর্ঘ কবিতাটির শেষ প্রান্তে। এটা সম্ভব হয় প্রধানত ওই অতিপর্বের কারসাজিতেই। কবিতার প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তি আবার পরীক্ষা করা যাক। প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষের ‘উল্লাসে’ শব্দে আছে তিন মাত্রা। অনায়াসেই এখানে বিরাম নেওয়া যেত, যেমন হাজারো বাংলা কবিতায় আমরা নিয়ে থাকি। কিন্তু এ কবিতায় তার কোনো উপায় নাই। পরের পঙ্‌ক্তির শুরুতেই ‘মোর’ শব্দের এক মাত্রা চুম্বকের মতো টানছে এই তিন মাত্রাকে। তার পরের পঙ্‌ক্তিতেও তাই। এক পঙ্‌ক্তি আরেক পঙ্‌ক্তিতে মিলে যাওয়ার এই ব্যবস্থাপনা ছাড়া বেগ ও আবেগের এই পসরা সম্ভবপর হতো কিনা সন্দেহ।

বলে রাখা দরকার, নজরুল অতিপর্ব ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। করেছেনও বহু কবিতায়। কিন্তু অতিপর্ব-মাত্রই গতির নিশ্চয়তা নয়। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতায় দেখছি স্ট্রেস বা ঝোঁকের নিপুণ ব্যবহারে শব্দগুলো এগিয়ে চলছে, আর সেই ঝোঁককে বিশেষভাবে জোরালো করছে হলন্ত ধ্বনির অবারিত আড়ম্বর। ‘প্রাকৃত-বাংলা’য় হলন্ত ধ্বনির বিশেষ ব্যঞ্জনা লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদনদের ‘সংস্কৃত-বাংলা’য়–যে ভাষার তিনি নিজেও একজন আত্মস্বীকৃত চর্চাকারী–স্বরধ্বনির লীলার মধ্যে হলন্তের ওই ব্যঞ্জনা হারিয়ে গিয়েছিল বলে তিনি আফসোস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাকৃত-বাংলা বলতেন, যার একটা রূপ তিনি সচেতনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন শেষ বয়সের ছেলেবেলা বইতে, তার প্রতি নজরুলের কোনো সচেতন আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান কবিতায় হলন্ত ধ্বনির প্রাচুর্য আর প্রয়োগ-সাফল্য দেখে রবীন্দ্রনাথ-কথিত প্রাকৃত-বাংলার হলন্ত-প্রাচুর্যের কথাই মনে আসে। আরও মনে হয়, নজরুলের শব্দ-সঞ্চয়ের স্বভাবের সঙ্গে এই ধ্বনি-নৈপুণ্য বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

আমরা জানি, নজরুল ধ্বনির অনুরোধে শব্দকে প্রশ্রয় দিতেন, যেমন গানের শব্দ বাছাই করতেন প্রথমত সুরের সম্মোহনে। এ কবিতায়ও তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের

‘হাসি’, ‘কাঁদন’, ‘মুক্তি’, ‘বাঁধন’, ‘মুখ ফুটে’, ‘বুক ফাটে’, ‘তিক্ত দুখ’, ‘রিক্ত বুক’ ইত্যাদি এবং তৃতীয় স্তবকের ‘আস্‌ল উদাস’, ‘শ্বস্‌ল হুতাশ’, ‘বুক-ফাটা শ্বাস’ ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যবহার একদিকে নিখুঁত অনুপ্রাসের আয়োজনে কানকে আমোদিত করে, অন্যদিকে আবার ধ্বনির মন্ত্রণায় আপাত-বিশৃঙ্খল শব্দ-যোজনার ইশারা দেয়। একে আমরা ক্ষেত্রগুপ্তের অনুকরণে বলতে পারি ‘অসংযমের শিল্প’, কিংবা সৈয়দ আলী আহসানের মতো বলতে পারি, পাহাড়ি ঝরনার উপল-মুখরিত অনিয়ন্ত্রিত পথচলা। নজরুলের কবিতার শব্দ-সঞ্চয় সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত ও সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষায়ণ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সে কেবল শব্দের ধ্বনিরূপ বা শরীরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কী ঘটে যখন কবিতার শব্দ ছন্দ-ধ্বনি-সুরের অমিত সম্মোহন তৈরির পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন অর্থ সৃজনে অর্থাৎ ‘অর্থ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে’ অংশ নেয়? আমরা জানি, বড় কবিমাত্রই ভাষার প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন এবং কেবল এভাবেই নতুন অর্থ প্রস্তাব করেন। আধুনিক জমানার বেশির ভাগ কবিতা শব্দের চিত্ররূপ ও অর্থরূপকে প্রাধান্য দিয়ে বা দিতে গিয়ে ধ্বনিরূপকে গৌণ করে তোলে। নজরুল সম্ভবত বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি যাঁর প্রধান রচনাগুলোতে এ দুইয়ের উৎকৃষ্ট সমন্বয় ঘটেছে। শব্দের ব্যঞ্জনাধর্মের সঙ্গে শরীরী-রূপ সমান মূল্যে বৃত হয়েছে। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ এর তাৎপর্যপূর্ণ নজির। কবিতার শব্দবিন্যাস যে বিচিত্র অর্থের সম্ভাবনা তৈরি করে তার পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া কার্যত অসম্ভব। শুধু বৈচিত্র্যের জন্য নয়; পাঠক-ভেদেই পাঠ ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু এখানে যে কারও চোখে পড়বে পরস্পর সম্পর্কিত নয় এমন শব্দ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত শব্দযুগলের সহাবস্থান। এবং তার ফলে আমরা মনের একটা অবস্থার প্রতীতি পাব,যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যৌথভাবে ক্রিয়াশীল থেকে বিশেষ উচ্ছ্বাসকে ভাষারূপ দিয়েছে। আমাদের মনে হবে, বিপরীত শব্দগুলো ভাষার নিত্য ব্যবহারে যেরকম বিপরীত ভাবের প্রকাশক হয়, তা সত্যের খুব উপরিতলের প্রকাশমাত্র। গভীরে বিপরীত ভাবগুলো একাকার হয়ে সহাবস্থান করতে পারে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে প্রধান হয়ে ওঠা অনুভূতির মধ্যেই একত্রে কাজ করতে পারে অনেকগুলো আপাত-অসম্পর্কিত ভাব-স্বভাব। এর ফলে শব্দগুলোর প্রচলিত অর্থ আমূল বদলে যেতে পারে; যেমনটা ঘটে থাকে ভাষার বিপ্লবে বা বিপ্লবের ভাষায়। ‘আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে’ কবিতার প্রথম দুই স্তবকেই এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির ইশারা আছে। এ ইশারা একটু পরেই প্রকাশ্য ঘোষণায় রূপান্তরিত হবে, যখন আমরা পড়ব:

ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

এই উল্লাস প্রাথমিকভাবে পৈশাচিক, যদি এই ধ্বংসযজ্ঞ নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে সামনে নিয়ে না আসে। একমাত্র ওই বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞে উল্লসিত হওয়া যায়, কিংবা নিজেই উদ্যোগী হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ সম্ভব করে তোলা যায়, যেখানে নতুন সম্পর্ক বা অর্থের প্রয়োজনে বিদ্যমানকে আমূলভাবে বদলে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

হ্যাঁ, এই নিগূঢ় অর্থেই 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতা ঘোষিতভাবে বিপ্লবী। এখানে নজরুল নিজের কাব্য-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বাত্মক বিপ্লবের বেশেই উপস্থাপন করেছেন। বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব। বিপ্লবী সম্ভাবনাই তাঁর উল্লাসের হেতু; তাঁর কাব্যিক আয়োজনের আর সব ইনতেজামও বিপ্লবের অনুকূলেই। সেখানে চোখে পড়বে ধ্বংসের সর্বাত্মক আয়োজন। বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল আর দানব-দলনী দুর্গা অপরাপর রূপ মুলতবি রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত। এমনকি মদনের প্রেমাস্ত্রটিও খুনমাখা। কবিতার চতুর্থ স্তবকে আমরা দেখব লালের রাজত্ব। ফাগুনের আগুন হয়ে বিপ্লবী জোশে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে পলাশ, অশোক, শিমুল বা রঙ্গন। আর সব আয়োজন সমাপ্ত হবে এক সুগভীর মর্মার্থে:

মোর  ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে।

নতুন জন্মের স্বার্থে পুরাতনকে চিহ্নিত করা এবং নিশ্চিহ্ন করা–এটাই নজরুলের প্রথম জমানার কাব্য-মন্ত্র। প্রশ্ন হলো, এই মহাযজ্ঞে কবির নিজের অবস্থান কোথায়? তিনি কি উৎসাহদানকারী? তিনি কি পর্যবেক্ষক? তিনি কি ঘটে যাওয়া বা ঘটমান বাস্তবতার বিবৃতিকার? নাকি তিনি আশা-আকাঙ্ক্ষা বা তত্ত্বের উদগাতা, যার বাস্তবায়ন হবে অন্যদের হাতে? না, এর কোনোটাই নজরুল নন। অন্তত প্রথম পর্বের নজরুল। নিজেকে অনেকবার যে অভিধায় চিহ্নিত করেছেন, তিনি তা-ই–সৈনিক। ওপরের পঙ্‌ক্তিটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়, যে বিপুল কাণ্ড বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, কবি তার কেন্দ্রীয় চরিত্র। সক্রিয় চরিত্র। এই সক্রিয় তাণ্ডব আসে ক্ষোভ থেকে, যে ক্ষোভ জন্ম নেয় বিদ্যমান চিহ্নব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা দেখে; ধ্বংসযজ্ঞের এই অনুমোদন আসে অভাববোধ থেকে, দুনিয়াকে যেভাবে দেখতে চাই তার অনুপস্থিতিজনিত অভাব। আর আসে এক গভীর বেদনাবোধ থেকে, মানুষের দুর্দশাকে নিজের বলে উপলব্ধি করতে পারার মহানুভবতাই সেই বেদনাবোধের উৎস। বিপ্লবীর এই কোমল-করুণ বাস্তবতাও যথাসম্ভব ঘোষিত হয়েছে এ কবিতায়। নানা রূপে। নানা মাত্রায়। একটা রূপ স্মরণীয় ভাষা পেয়েছে কবিতার পঞ্চম স্তবকে।

পঞ্চম স্তবকে আছে নারীদের কথা। আজকালকার লিঙ্গীয়-স্পর্শকাতরতার দিনে এর কোনো কোনো ইমেজ বা উচ্চারণ আপত্তিকর মনে হতেও পারে। সে ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে রাখাই ভালো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বক্তব্যটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ; উপস্থাপন-কলা উপভোগ্য। দেখা যাচ্ছে, নারীদের একটা দল দুর্গার সাক্ষাৎ মূর্তি, যাদের পায়ে লেগে আছে রক্তের চিহ্ন; আরেকটি দল ক্ষোভে-বিক্ষোভে 'আগুন' হয়ে তৈরি হয়ে আছে সম্ভাব্য তৎপরতার জন্য। কিন্তু তাদেরই আরেকটা দল অভিমানী। চোখের জলই তাদের ভাষা। 'বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না'–প্রচলিত এই বাগবিধি কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে একবার বিশেষ রূপে বিনির্মিত হয়েছিল। এখানে আরেকবার সম্পূর্ণ অন্য রূপে। কবি বলছেন, এ রকম ভাষাহীন যারা, তাদের ভাষা প্রকাশ করা তাঁর দায়িত্ব। তাঁর সেই ক্ষমতা আছে এবং সহানুভূতিও আছে। ফলে অশ্রুমাখা শব্দযোগে তিনি তাদের না-বলা কথাগুলো প্রকাশ করে যান। এ তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেরই অংশ। কারণ, সহানুভূতির ক্ষমতা ছাড়া কারও পক্ষে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব নয়। একই কারণে এই স্রষ্টা-কবির আজকের বিশিষ্ট উল্লাসের ভাষায় যখন আশ্বিনের শিথিল হয়ে ঝরে-পড়া শিউলির কথা আসে, বা দূর্বার গায়ে হাস্যোজ্জ্বল শিশিরের কথা, তখন বিপ্লবী কবির মূল প্রেরণায় কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। বিপ্লবের পরিধি ও মাত্রা আরেকবার চিহ্নিত হয় মাত্র।

যদি বলি, 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতায় একজন বিপ্লবী কবির কাব্য-ইশতেহার বিপ্লবী কেতায় প্রকাশিত হয়েছে, তাহলে একটা সত্য বিবরণী হয় বটে। কিন্তু দেহ আর মন মিলে এ এক শরীরী-পরিচয় কেবল। অনির্বচনীয় যে ভাব জমে ওঠার কারণে একটা কবিতা আদৌ 'ভালো' কবিতা হয়ে ওঠে, ভাষার পরিচিতিতে তাকে স্পর্শ করা তো সহজ কর্ম নয়। এ কবিতা প্রসঙ্গে যেমন আমরা এখনো শিবের প্রসঙ্গ তুলিনি। অথচ নজরুলের আরও কোনো কবিতার মতো এ কবিতায়ও আছে শিবের অ-ধরা ছবি। তার ভাবে-স্বভাবে এবং রূপে। এ কবিতার প্রধান পরিচয় তো এই যে এটি একটি নৃত্যপর কবিতা, আর সে নৃত্য তাণ্ডব ছাড়া কিছু নয়। যদি একক ক্যানভাসে শিব-নৃত্যের এমন কোনো মুদ্রা কোনো এক অনুপ্রাণিত মুহূর্তে এমনভাবে বন্দী করা যায়, যেখানে তুলির পেশল টানগুলো অনির্দেশ্য সুদূরকে ধরে ফেলবে কায়দামতো, আর তাতে নাচের বেগ, সৌন্দর্য আর গতি ফুটে বেরোবে বাঙ্ময় হয়ে, তাহলে সে ছবিই কেবল হয়ে উঠতে পারে এ কবিতার যোগ্য উপমা।

## লেখক পরিচিতি:

কাজী নজরুল ইসলাম (মে ২৫, ১৮৯৯ - আগস্ট ২৭, ১৯৭৬), (জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৩০৬ - ভাদ্র ১২, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), অগ্রণী বাঙালি কবি, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সংগীতস্রষ্টা, দার্শনিক, যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ - দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে বিদ্রোহী কবি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। বিংশ শতাব্দীর বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তাঁর কবিতা ও গানে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা হাতে তাঁর প্রবেশ, ধূমকেতুর মতো তাঁর প্রকাশ। যেমন লেখাতে বিদ্রোহী, তেমনই জীবনে -- কাজেই "বিদ্রোহী কবি"। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উভয় বাংলাতে প্রতি বৎসর উদযাপিত হয়ে থাকে।

নজরুল এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মীয়। স্থানীয় এক মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজও করেছিলেন। কৈশোরে বিভিন্ন থিয়েটার দলের সাথে কাজ করতে যেয়ে তিনি কবিতা, নাটক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এসময় তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। এসময় তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন বিদ্রোহী এবং ভাঙার গানের মত কবিতা; ধূমকেতুর মত

সাময়িকী। জেলে বন্দী হলে পর লিখেন রাজবন্দীর জবানবন্দী। এই সব সাহিত্যকর্মে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ছিল সুস্পষ্ট। ধার্মিক মুসলিম সমাজ এবং অবহেলিত ভারতীয় জনগণের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্য তিনি এক নতুন ধারার জন্ম দেন। এটি হল ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল। এর পাশাপাশি তিনি অনেক উৎকৃষ্ট শ্যামাসংগীত ও হিন্দু ভক্তিগীতিও রচনা করেন। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা এবং অধিকাংশে সুরারোপ করেছেন যেগুলো এখন নজরুল সঙ্গীত বা "নজরুল গীতি" নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়।

মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। একই সাথে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালে তিনি সপরিবারে ঢাকা আসেন। এসময় তাকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।।

ইসলাম, কাজী নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। নজরুলের ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যু হলে নজরুল পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য হাজী পালোয়ানের মাযারের সেবক এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করেন। তিনি গ্রামের মকতব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। শৈশবের এ শিক্ষা ও শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে নজরুল অল্পবয়সেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠান, যেমন পবিত্র কুরআন পাঠ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণে ওই অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল।

## সম্প্রসারিত:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে ‘বুলবুল’ নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই ‘ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতা’র সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা

নিষিদ্ধ করে এবং তাঁকে কারাদন্ডে দন্ডিত করে। নজরুলও আদালতে লিখিত রাজবন্দীর জবানবন্দী দিয়ে এবং প্রায় চল্লিশ দিন একটানা অনশন করে ইংরেজ সরকারের জেল-জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং এর সমর্থনে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা জানান।

নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কবিতায় তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণাকে ধারণ করায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে মানবসভ্যতার কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্যচেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস, সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব।

বাংলা সঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারার পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি, বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং লোকসঙ্গীতাশ্রয়ী বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নজরুলের মৌলিক সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচায়ক। নজরুলসঙ্গীত বাংলা সঙ্গীতের অণুবিশ্ব, তদুপরি উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল বাংলা গানকে যথার্থ আধুনিক সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন।

মকতব, মাযার ও মসজিদ-জীবনের পর নজরুল রাঢ় বাংলার (পশ্চিম বাংলার বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল) কবিতা, গান আর নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক লোকনাট্য লেটোদলে যোগদান করেন। ঐসব লোকনাট্যের দলে বালক নজরুল ছিলেন একাধারে পালাগান রচয়িতা ও অভিনেতা। নজরুলের কবি ও শিল্পী জীবনের শুরু এ লেটোদল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও লেটোদল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা ও গান রচনার কৌশল নজরুল লেটো বা কবিগানের দলেই রপ্ত করেন। এ সময় লেটোদলের জন্য কিশোর কবি নজরুলের সৃষ্টি চাষার সঙ, শকুনিবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের সঙ, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি।

১৯১০ সালে নজরুল পুনরায় ছাত্রজীবনে ফিরে যান। প্রথমে তিনি রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুল এবং পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে (পরে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন) ভর্তি হন। শেষোক্ত স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক; নজরুল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আর্থিক অনটনের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পর নজরুলের ছাত্রজীবনে আবার বিঘ্ন ঘটে। মাথরুন স্কুল ছেড়ে তিনি প্রথমে বাসুদেবের কবিদলে, পরে এক খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের

খানসামা পদে এবং শেষে আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কাজ নেন। এভাবে কিশোর শ্রমিক নজরুল তাঁর বাল্যজীবনেই রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন।

চা-রুটির দোকানে চাকরি করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয় এবং তাঁর সুবাদেই নজরুল ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এক বছর পর তিনি পুনরায় নিজের গ্রামে ফিরে যান এবং ১৯১৫ সালে আবার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ স্কুলে নজরুল ১৯১৫-১৭ সালে একটানা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষার সময় ১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ছাত্রজীবনের শেষ বছরগুলিতে নজরুল সিয়ারসোল স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা হলেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী ভাবধারায় নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফারসি সাহিত্যে হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্যচর্চায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর নজরুলের সামরিক জীবনের পরিধি। এ সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্টের একজন সাধারণ সৈনিক থেকে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মৌলবির নিকট তিনি ফারসি ভাষা শেখেন, সঙ্গীতানুরাগী সহসৈনিকদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং একই সঙ্গে সমভাবে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যচর্চা করেন। করাচি সেনানিবাসে বসে রচিত এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, মে ১৯১৯) নামক প্রথম গদ্য রচনা, প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই ১৯১৯) এবং অন্যান্য রচনা: গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে'; কবিতা 'আশায়', 'কবিতা সমাধি' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, করাচি সেনানিবাসে থেকেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা, যেমন: প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্ম্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমনকি ফারসি কবি হাফিজেরও কিছু গ্রন্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আনুষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার শুরু করাচির সেনানিবাসে থাকাবস্থায়ই।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল দেশে ফিরে কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম আশ্রয় ছিল ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি-র অফিসে সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। শুরুতেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সদ্যোরচিত বাঁধন-হারা উপন্যাস এবং 'বোধন', 'শাত-ইল-আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহরর্ম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্দহম্' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের এ নবীন প্রতিভার প্রতি সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি পড়ে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার

মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী' এবং 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাদুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বাংলার সারস্বত সমাজে তাঁকে স্বাগত জানান। নজরুল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আফজালুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। অপরদিকে কলকাতার তৎকালীন জমজমাট দুটি সাহিত্যিক আসর 'গজেনদার আড্ডা' ও 'ভারতীয় আড্ডা'য় অতুলপ্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যজগতের দিকপালদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; তখন থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দু দশক বাংলার দু প্রধান কবির মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন ছিল।

এ.কে ফজলুল হকের (শেরে-বাংলা) সম্পাদনায় অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমেই নজরুলের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। নজরুলের লেখা 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধের জন্য ওই বছরেরই আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। নবযুগ পত্রিকার সাংবাদিকরূপে নজরুল যেমন একদিকে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক জগতের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লিখছিলেন, তেমনি মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হচ্ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘরোয়া আসর ও অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তরুণ কবির সংস্কৃতিচর্চাও অগ্রসর হচ্ছিল। নজরুল তখনও নিজে গান লিখে সুর করতে শুরু করেন নি, তবে তাঁর কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপিসহ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনী সেনগুপ্তা, যেমন: 'হয়ত তোমার পাব দেখা', 'ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী'। নজরুলের গান 'বাজাও প্রভু বাজাও ঘন' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকার ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায়।

১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাস নজরুলের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এ সময় তিনি মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে পরিচিত হন পুস্তক প্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গেই নজরুল প্রথম কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। এখানে তিনি প্রমীলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং এ পরিচয়ের সূত্র ধরেই পরে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

কুমিল্লা থেকে নজরুল দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের বাড়িতে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে ১৯ জুন পুনরায় কুমিল্লায় ফিরে তিনি ১৭ দিন অবস্থান করেন। তখন

অসহযোগ আন্দোলনে  কুমিল্লা উদ্বেলিত। নজরুল বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও সভায় যোগ দিয়ে গাইলেন সদ্যোরচিত ও সুরারোপিত স্বদেশী গান: 'এ কোনো পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়', 'আজি রক্ত-নিশি ভোরে/ একি এ শুনি ওরে/ মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে' প্রভৃতি। এভাবেই কলকাতার সৌখিন গীতিকার ও গায়ক নজরুল কুমিল্লায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগরণী গান রচনা ও পরিবেশনার মধ্য দিয়ে স্বদেশী গান রচয়িতা ও রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত হন।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল আবার কুমিল্লা যান। ২১ নভেম্বর ভারতব্যাপী হরতাল ছিল। নজরুল পুনরায় পথে নামেন এবং অসহযোগ মিছিলের সঙ্গে শহর প্রদক্ষিণ করে গাইলেন: 'ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী।' এ সময় তুরস্কে মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতে মুসলমানরা  খিলাফত আন্দোলন করছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আর মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনের দর্শনে নজরুল আস্থাশীল ছিলেন না। স্বদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জন আর মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের সালতানাত উচ্ছেদকারী নব্য তুর্কি আন্দোলনের প্রতি নজরুলের সমর্থন ছিল; তথাপি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্যই তিনি ওই দুটি আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে  কলকাতা ফেরার পর নজরুলের দুটি ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে 'বিদ্রোহী' কবিতা ও 'ভাঙার গান' সঙ্গীত। এ দুটি রচনা বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল; 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য নজরুল বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১৯২১ সালের শেষদিকে নজরুল আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'কামাল পাশা' রচনা করেন, যার মাধ্যমে তাঁর সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনা এবং ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল তাঁর রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্ব দ্বারা, কারণ তিনি সামন্ততান্ত্রিক খিলাফত বা তুরস্কের সুলতানকে উচ্ছেদ করে তুরস্ককে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। তুরস্কের সমাজজীবন থেকে মোস্তফা কামাল যে মৌলবাদ ও পর্দাপ্রথা দূর করেছিলেন, তা নজরুলকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, তুরস্কে যা সম্ভবপর, ভারত ও বাংলায় তা সম্ভবপর নয় কেন? বস্তুত, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও আচারসর্বস্বতা থেকে দেশবাসী, বিশেষত স্বধর্মীদের মুক্তির জন্য নজরুল আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও নজরুলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। নজরুলের  লাঙল ও গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কবিতাগুচ্ছ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুবাদ 'জাগ অনশন বন্দী ওঠ রে যত' এবং 'রেড ফ্লাগ' অবলম্বনে রক্তপতাকার গান এর প্রমাণ।

১৯২২ সালে নজরুলের যেসব সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয় সেসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গল্প-সংকলন ব্যথার দান, কবিতা-সংকলন অগ্নি-বীণা ও প্রবন্ধ-সংকলন যুগবাণী। বাংলা কবিতার পালাবদলকারী কাব্য অগ্নি-বীণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায় এবং পরপর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়; কারণ এ কাব্যে নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'শাত-ইল্-আরব', 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগানো এবং বাংলা কবিতার মোড় ফেরানো কবিতা সংকলিত হয়েছিল।

১৯২২ সালে নজরুলের অপর বিপ্লবী উদ্যম হলো  ধূমকেতু পত্রিকার প্রকাশ (১২ আগস্ট)। পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতো। বিশের দশকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সশস্ত্র বিপ্লববাদের পুনরাবির্ভাবে ধূমকেতু পত্রিকার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ছিল। এক অর্থে এ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের মুখপত্র। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু। অাঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এ দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।' রবীন্দ্রনাথের এ আশীর্বাণী শীর্ষে ধারণ করে। ধূমকেতুর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে ৮ নভেম্বর পত্রিকার ওই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করা হয়। নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ যুগবাণী বাজেয়াপ্ত হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২। একই দিনে নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয়। বিচারাধীন বন্দি হিসেবে ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে যে জবানবন্দী প্রদান করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে সাহিত্য-মর্যাদা পেয়ে আসছে। ১৬ জানুয়ারি বিচারের রায়ে নজরুল এক বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

নজরুল যখন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত গীতিনাট্য তাঁকে উৎসর্গ করেন (২২ জানুয়ারি ১৯২৩)। এ ঘটনায় উল্লসিত নজরুল জেলখানায় বসে তাঁর অনুপম কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' রচনা করেন। সমকালীন অনেক রবীন্দ্রভক্ত ও অনুরাগী কবি-সাহিত্যিক বিষয়টি ভালো চোখে দেখেন নি। এ ব্যাপারে কেউ কেউ অভিযোগ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নজরুল-কাব্যপাঠের পরামর্শ দেন এবং বলেন, '...যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।'

১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল নজরুলকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হয়। রাজবন্দিদের প্রতি ইংরেজ জেল-সুপারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ওই দিন থেকেই তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে নজরুলকে টেলিগ্রাম করেন: 'Give up hunger strike, our literature claims you.' অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের কারণে নজরুল টেলিগ্রামটি পান নি। এদিকে জনমতের চাপে ১৯২৩ সালের ২২ মে জেল-পরিদর্শক ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী হুগলি জেল পরিদর্শন করেন এবং তাঁর আশ্বাস ও

অনুরোধে ওই দিনই নজরুল চল্লিশ দিনের অনশন ভঙ্গ করেন। নজরুলকে ১৯২৩ সালের ১৮ জুন বহরমপুর জেলে স্থানান্তর করা হয় এবং এক বছর তিন সপ্তাহ কারাবাসের পর ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। হুগলি জেলে বসে নজরুল রচনা করেন 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল', আর বহরমপুর জেলে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্ছে জুয়া' এ বিখ্যাত গান দুটি।

নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতির কবিতার প্রথম সংকলন দোলন-চাঁপা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের অক্টোবরে। এতে সংকলিত দীর্ঘ কবিতা 'পূজারিণী'-তে নজরুলের রোমান্টিক প্রেম-চেতনার বহুমাত্রিক স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কলকাতায় নজরুল ও প্রমীলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রমীলা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তাঁর মা গিরিবালা দেবী ছাড়া পরিবারের অন্যরা এ বিবাহ সমর্থন করেননি। নজরুলও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। হুগলির মহীয়সী মহিলা মিসেস মাসুমা রহমান বিবাহপর্বে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। নজরুল হুগলিতে সংসার পাতেন।

১৯২৪ সালের ১০ আগস্ট নজরুলের গান ও কবিতা সংকলন বিষের বাঁশী এবং একই মাসে ভাঙ্গার গান প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই ওই বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯২৫ সালে নজরুলের গানের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস (এইচ.এম.ভি) কোম্পানি থেকে, যদিও ১৯২৮ সালের আগে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হন নি। শিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্ছে জুয়া' ও 'যাক পুড়ে যাক বিধির বিধান সত্য হোক' গান দুটি রেকর্ড করা হয়।

নজরুল এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং স্বরচিত স্বদেশী গান পরিবেশন করে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তাঁর একটি জনপ্রিয় স্বদেশী গান 'ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চর্কা ঘোর' ১৯২৫ সালের মে মাসে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপস্থিতিতে পরিবেশন করেন। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি কুমিল্লা, মেদিনীপুর, হুগলি, ফরিদপুর, বাঁকুড়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। নজরুল এ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য হওয়া ছাড়াও শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জন্য 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। রাজনীতিক নজরুলের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল সাপ্তাহিক লাঙ্গল পত্রিকা প্রকাশ (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫)। তিনি এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এর প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাসমষ্টি মুদ্রিত হয়। লাঙ্গল ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম শ্রেণিসচেতন সাপ্তাহিক পত্রিকা। এতে প্রকাশিত 'শ্রমিক-প্রজা-

স্বরাজ দলে'র ম্যানিফেস্টোতে প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়। এ সময় নজরুল পেশাজীবী শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের উপযোগী সাম্যবাদী ও সর্বহারা  কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯২৬ সালে নজরুল কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেন এবং বাংলা গানে এক নতুন ধারার সংযোজন করেন। তিনি স্বদেশী গানকে স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বহারা শ্রেণির গণসঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন। স্মরণীয় যে, ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল কলকাতার প্রথম বামপন্থী সাপ্তাহিক গণবাণীর (১৯২৭ সালের ১২ আগস্ট থেকে গণবাণী ও লাঙ্গল একীভূত হয়) জন্য রচনা করেন 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' ও 'রেড ফ্লাগ' অবলম্বনে 'জাগো অনশন বন্দী', 'রক্তপতাকার গান' ইত্যাদি। ১৯২৫ সালে নজরুলের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: গল্প-সংকলন রিক্তের বেদন, কবিতা ও গানের সংকলন চিত্তনামা, ছায়ানট, সাম্যবাদী ও পূবের হাওয়া। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যুতে (১৬ জুন ১৯২৫) শোকাহত নজরুল কর্তৃক রচিত গান ও কবিতা নিয়ে চিত্তনামা গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

১৯২৬ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্যপদের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নজরুলের রাজনৈতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ উপলক্ষে তিনি পূর্ববাংলায়, বিশেষত ঢাকা বিভাগে ব্যাপকভাবে সফর করেন। স্কুলজীবনে ত্রিশাল-দরিরামপুরে থাকাকালে এ অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হয়, রাজনৈতিক ও বৈবাহিক কারণে তা আরও গভীর হয়।

নজরুল ছিলেন বাংলা  গজল গানের স্রষ্টা। গণসঙ্গীত ও গজলে যৌবনের দুটি বিশিষ্ট দিক সংগ্রাম ও প্রেমের পরিচর্যাই ছিল মুখ্য। নজরুল গজল আঙ্গিক সংযোজনের মাধ্যমে বাংলা গানের প্রচলিত ধারায় বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। তাঁর অধিকাংশ গজলের বাণীই উৎকৃষ্ট কবিতা এবং তার সুর রাগভিত্তিক। আঙ্গিকের দিক থেকে সেগুলি উর্দু গজলের মতো তালযুক্ত ও তালছাড়া গীত। নজরুলের বাংলা গজল গানের জনপ্রিয়তা সমকালীন বাংলা গানের ইতিহাসে ছিল তুলনাহীন। ১৯২৬-২৭ সালে কৃষ্ণনগর জীবনে নজরুল উভয় ধারায় বহুসংখ্যক গান রচনা করেন। ওই সময়ে তিনি নিজের গানের স্বরলিপি প্রকাশ করতে থাকেন। এসব গান থেকে স্পষ্ট হয় যে, নজরুলের সৃজনশীল মৌলিক সঙ্গীত প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটে ১৯২৬-২৭ সালে কৃষ্ণনগরে। অথচ নজরুলের কৃষ্ণনগর জীবন ছিল অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট। তখনও পর্যন্ত নজরুল কোনো প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন নি, তবে দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবীর মতো বড় মাপের শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ নজরুলের গানকে বিভিন্ন আসরে ও অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে জনপ্রিয় করে তোলেন।

১৯২৭ সালে একদিকে সাপ্তাহিক  শনিবারের চিঠি-তে রক্ষণশীল হিন্দু বিশেষত ব্রাহ্মণসমাজের একটি অংশ থেকে, অপরদিকে মৌলবাদী মুসলমান সমাজের ইসলাম দর্শন,

মোসলেম দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল-সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনার ঝড় ওঠে। শনিবারের চিঠি-তে নজরুলের বিভিন্ন রচনার প্যারডি প্রকাশিত হতে থাকে। তবে নজরুলের সমর্থনে কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি প্রগতিশীল পত্রিকা এগিয়ে আসে। ১৯২৭ সালে নজরুলের কবিতা ও গানের সংকলন ফণি-মনসা এবং পত্রোপন্যাস বাঁধন হারা প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য পুনরায় ঢাকা আসেন। সেবার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক  কাজী মোতাহার হোসেন, ছাত্র  বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত এবং গণিতের ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচিত হন। একই বছর জুন মাসে পুনরায় ঢাকা এলে সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্রের রানু সোম (প্রতিভা বসু) ও উমা মৈত্রের (লোটন) সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। অর্থাৎ এ সময় পরপর তিনবার ঢাকায় এসে নজরুল ঢাকার প্রগতিশীল অধ্যাপক, ছাত্র ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ওদিকে ১৯২৮ সালে কলকাতায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র মাসিক  মোহাম্মদী পত্রিকায় নজরুল-বিরোধিতা শুরু হয়, কিন্তু মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সওগাত পত্রিকা বলিষ্ঠভাবে নজরুলকে সমর্থন করে। নজরুল সওগাতে যোগদান করে একটি রম্য বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সওগাতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে  আবুল কালাম শামসুদ্দীন নজরুলকে যুগপ্রবর্তক কবি ও বাংলার জাতীয় কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

নজরুল ১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে, ১৯২৯ সালে বেতার ও মঞ্চের সঙ্গে এবং ১৯৩৪ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এইচ.এম.ভি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গীত-রচয়িতা ও প্রশিক্ষকরূপে যুক্ত ছিলেন। এইচ.এম.ভি-তে নজরুলের প্রশিক্ষণে প্রথম রেকর্ডকৃত তাঁর দুটি গান ‘ভুলি কেমনে’ ও ‘এত জল ও কাজল চোখে’ গেয়েছিলেন আঙ্গুরবালা। নজরুলের নিজের প্রথম রেকর্ড ছিল স্বরচিত ‘নারী’ কবিতার আবৃত্তি। নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার করেন ১৯২৯ সালের ১২ নভেম্বর সান্ধ্য অধিবেশনে। ১৯২৯ সালে মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রক্তকমল নাটকের জন্য নজরুল গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেন। শচীন্দ্রনাথ ওই নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। ১৯৩০ সালে মঞ্চস্থ মন্মথ রায়ের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী নাটক কারাগার-এ নজরুলের আটটি গান ছিল, নাটকটি একটানা ১৮ রজনী মঞ্চস্থ হওয়ার পর সরকার নিষিদ্ধ করে।

১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে বাঙালিদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন ব্যারিস্টার  এস ওয়াজেদ আলি, শুভেচ্ছা ভাষণ দেন বিশিষ্ট রাজনীতিক  সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) এবং রায়বাহাদুর  জলধর সেন। কবিকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দেওয়া হয়। এ সংবর্ধনা সভায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন,

‘আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হইবে।’ সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে! আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।’

১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুল  চট্টগ্রাম সফরে আসেন এবং  হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার ভাইবোনের আতিথ্য গ্রহণ করেন; বন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমদের জন্মস্থান সনদ্বীপও ভ্রমণ করেন। ১৯২৮-২৯ সালে নজরুলের প্রকাশিত কবিতা ও গানের সংকলনের মধ্যে ছিল: সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৮), সঞ্চিতা (১৯২৮); বুলবুল (১৯২৮), জিঞ্জীর (১৯২৮) ও চক্রবাক (১৯২৯)। ১৯২৯ সালে কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচীর জন্ম হয়, আর মে মাসে চার বছরের প্রিয়পুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। কবি এতে প্রচন্ড আঘাত পান। অনেকে বলেন এ মৃত্যু কবির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে ওঠেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বুলবুলের রোগশয্যায় বসে নজরুল হাফিজের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করছিলেন, যা পরে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের রাজনৈতিক উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা, গানের সংকলন নজরুল-গীতিকা, নাটিকা ঝিলিমিলি এবং কবিতা ও গানের সংকলন প্রলয়-শিখা ও চন্দ্রবিন্দু। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত এবং প্রলয়-শিখা-র জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। ১৯৩০ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত আদালতের রায়ে নজরুলের ছয় মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়, নজরুল হাইকোর্টে আপিল ও জামিন লাভ করেন। ইতোমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে হাইকোর্ট কর্তৃক নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা খারিজের আদেশ দেওয়া হয়, ফলে নজরুলকে দ্বিতীয়বার কারাবাস করতে হয় নি।

১৯৩১ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নজরুল দার্জিলিং সফর করেন। রবীন্দ্রনাথও তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। এ বছর প্রকাশিত হয় নজরুলের উপন্যাস কুহেলিকা, গল্প-সংকলন শিউলিমালা, গানের স্বরলিপি নজরুল-স্বরলিপি এবং গীতিনাট্য আলেয়া। নজরুলের এ নাটকটি কলকাতার নাট্যনিকেতনে (৩ পৌষ ১৩৩৮) প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এতে গানের সংখ্যা ছিল ২৮টি। ওই বছর নজরুল আরও যেসব নাটকের জন্য গান রচনা ও সুরারোপ করেন সেসবের মধ্যে ছিল যতীন্দ্রমোহন সিংহের ধ্রুবতারা উপন্যাসের নাট্যরূপের চারটি গান (কেবল সুর সংযোজন), মন্মথ রায়ের সাবিত্রী নাটকের ১৩টি গান (রচনা ও সুরারোপ)। ১৯৩২ সালে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত মন্মথ রায়ের মহুয়া নাটকের গানগুলির রচয়িতাও ছিলেন নজরুল।

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলমান তরুণ সম্মেলনে এবং ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের সভাপতি কবি  কায়কোবাদ নজরুলকে মাল্যভূষিত করেন। ১৯৩২ সালে

নজরুলের প্রকাশনার মধ্যে সবগুলিই ছিল গীতিসংকলন, যেমন: সুর-সাকী, জুলফিকার ও বন-গীতি।

১৯৩২-৩৩ সাল এক বছর নজরুল এইচ.এম.ভি ছেড়ে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ কোম্পানির রেকর্ড করা প্রথম দুটি নজরুলসঙ্গীত ছিল ধীরেন দাসের গাওয়া 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী' ও 'লক্ষ্মী মা তুই'। ১৯৩৩ সালে নজরুল এক্সক্লুসিভ কম্পোজাররূপে এইচ.এম.ভি-তে পুনরায় যোগদান করেন। এ সময় তাঁর অনেক গান রেকর্ড হয়। ১৯৩৩ সালে নজরুল তিনটি মূল্যবান অনুবাদ-কর্ম সমাপ্ত করেন: রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম এবং কাব্য আমপারা।

রেকর্ড, বেতার ও মঞ্চের পর নজরুল ১৯৩৪ সালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি প্রথমে যে ছায়াছবির জন্য কাজ করেন সেটি ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাহিনী ভক্ত ধ্রুব (১৯৩৪)। এ ছায়াছবির পরিচালনা, সঙ্গীত রচনা, সুর সংযোজনা ও পরিচালনা এবং নারদের ভূমিকায় অভিনয় ও নারদের চারটি গানের প্লেব্যাক নজরুল নিজেই করেন। ছবির আঠারোটি গানের মধ্যে সতেরোটির রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন নজরুল। এ ছাড়া তিনি আর যেসব চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেগুলি হলো: পাতালপুরী (১৯৩৫), গ্রহের ফের (১৯৩৭), বিদ্যাপতি (বাংলা ও হিন্দি ১৯৩৮), গোরা (১৯৩৮), নন্দিনী (১৯৪৫) এবং অভিনয় নয় (১৯৪৫)। বিভিন্ন ছায়াছবিতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ব্যবহৃত নজরুলসঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। চলচ্চিত্রের মতো মঞ্চনাটকের সঙ্গেও নজরুল ত্রিশের দশকে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে নিজের রচিত দুটি নাটক আলেয়া ও মধুমালা সহ প্রায় ২০টি মঞ্চ নাটকের সঙ্গে নজরুল যুক্ত ছিলেন এবং সেসবে প্রায় ১৮২টি নজরুলসঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরূপ কয়েকটি নাটক হলো: রক্তকমল, মহুয়া, জাহাঙ্গীর, কারাগার, সাবিত্রী, আলেয়া, সর্বহারা, সতী, সিরাজদ্দৌলা, দেবীদুর্গা, মধুমালা, অন্নপূর্ণা, নন্দিনী, হরপার্বতী, অর্জুনবিজয়, ব্ল্যাক আউট ইত্যাদি। ১৯৩৪ সালে নজরুল-প্রকাশনার সবই ছিল সঙ্গীত-বিষয়ক, যেমন: গীতি-শতদল ও গানের মালা গীতিসংকলন এবং সুরলিপি ও সুরমুকুর স্বরলিপি সংগ্রহ।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে নজরুল কলকাতা বেতারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক মূল্যবান সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'হারামণি', 'মেল-মিলন' ও 'নবরাগমালিকা'। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে নজরুল বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগিতায় কলকাতা বেতার থেকে অনেক রাগভিত্তিক ব্যতিক্রমধর্মী সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন, যা ছিল নজরুলের সঙ্গীতজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৩৯ সালে নজরুল বেতারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকলেও এইচ.এম.ভি, মেগাফোন, টুইন ছাড়াও কলম্বিয়া, হিন্দুস্থান, সেনোলা, পাইওনিয়ার, ভিয়েলোফোন প্রভৃতি থেকেও নজরুলসঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালের মধ্যে নজরুলের এইচ.এম.ভি থেকে ৫৬৭টি, টুইন থেকে ২৮০টি, মেগাফোন থেকে

৯১টি, কলম্বিয়া থেকে ৪৪টি, হিন্দুস্থান থেকে ১৫টি, সেনোলা থেকে ১৩টি, পাইওনিয়ার থেকে ২টি, ভিয়েলোফোন থেকে ২টি এবং রিগ্যান থেকে ১টি মিলে প্রায় সহস্রাধিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। সব মিলে নজরুলের গানের সংখ্যা দ্বিসহস্রাধিক।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকাহত নজরুল তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করেন 'রবিহারা' ও 'সালাম অস্তরবি' কবিতা এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' শোকসঙ্গীত। 'রবিহারা' কবিত্রা নজরুল স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করেন কলকাতা বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে। 'ঘুমাইতে দাও' গানটিও কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে স্বকণ্ঠে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যেই নজরুল নিজেও অসুস্থ এবং ক্রমশ নির্বাক ও সম্বিতহারা হয়ে যান। দেশে ও বিদেশে কবির চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায় নি। ১৯৪২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪টি বছর কবির এ অসহনীয় নির্বাক জীবনকাল অতিবাহিত হয়।

ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে আনা হয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'একুশে পদকে' ভূষিত করে। ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।

**মো: রায়হান খান**
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu